Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 16-22
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.044

তিমিরের হার্লেম: শৈলীগত অনুধাবন

ড. প্রশান্ত বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabisankar Bal (1962-2017) was one of the famous writers in Bengali literature. He has written poetry, short story, novel and many essays covering other tradition, culture and literature. His literary creations are diverse, and his writing style is exceptional and uniquely his own. In this research paper we focus on literary stylistics of his novel 'Timirer Harlem'. His novels are not the traditional genre, but have become unique in their style, narrative and approach of presentation. In this study we seek to focus on various aspects of the stylistic analysis of his work.

Keywords: Form and Content, Narrative, Phonology, Syntax, Semantics

উপন্যাস মূলত ভাষা শৈলী। উপন্যাসের ভাষা বা প্রকাশভঙ্গিতে উপাদান সমন্বয় হয়ে ওঠে বৈচিত্রময়। লেখকরা প্রকরণ ঠিক করে নেন। কী বলবেন বা কী লিখবেন সেটা বড় নয়; কীভাবে লিখবেন সেটাই বড়। তখন লেখকের কাছে শৈলীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সত্তর দশকের আগেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের 'মডেল' বলতে বেশির ভাগ ছিল 'সোশ্যাল রিয়ালিজম' বা মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন চর্চাকে কেন্দ্র করে। আর এই কাহিনির মায়াকাজলে পাঠকও তৃপ্তিলাভ করেছিল গা ভাসিয়ে। কিন্তু সত্তর দশকের ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাসের আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সময়ের দাবি মেনে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক যেমন পরিবর্তন হয়েছিল, তেমনি পাঠকের স্বাদও বদলে যেতে লাগল ক্রমাগত। প্রথাগত কাহিনির মায়াকে পাঠক যখন প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন আখ্যান প্রণেতারাও সময় সম্পৃক্ত পরিসরে নতুন নতুন আখ্যান নির্মাণ করে চলেছেন। সত্তর দশকের এই জলবিভাজন রেখাই হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মাইলস্টোন। ইতিহাসের সময় ও পরিসরে বাঙালি ঐতিহ্যগত সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যেরও পালাবদল ঘটেছিল তীব্রভাবে। বিশ শতকের শেষ লগ্নে ও একুশ শতকের শূন্য দশকে এই রূপান্তরের সাথে, আরও নতুন নতুন কৃৎকৌশল উদ্ভাসনে উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গি অনিবার্য শর্তেই অন্য এক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন-

> "কাহিনি আর নিছক তথ্য ভারাক্রান্ত সাংবাদিকতা করে না, গল্পের মনোরঞ্জক মায়া দিয়ে পাঠকের জন্যে ইচ্ছাপূরণের আয়োজনও করে না। আর, তখনই উপন্যাস ধীরে ধীরে চিহ্নায়িত হয়ে ওঠে। বাচনের শিল্প একটু একটু করে সংকেতের দ্যোতনা সৃষ্টিতে বেশি মনোযোগী হতে থাকে। তার মানে কাহিনির আদল বহাল রেখেও বয়ানের মধ্যে জাগিয়ে তোলে কাহিনির উদ্বৃত্ত পরিসর।"[১]

রবিশংকর বল (১৯৬২-২০১৭) বিশ শতকের শেষ দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রচলিত গতানুগতিক ধারায় না লিখে, গল্প-উপন্যাসের বিষয়-আশয় নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিচরণভূমি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে যে স্বতন্ত্রতা ও মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন তা মূলত বিষয়বস্তু ও রচনা শৈলীর নির্মাণ কৌশলে। গল্প-উপন্যাসের বহু বিচিত্র বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শৈলীচেতনায় মননশীল বাচনভঙ্গি ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনবোধের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আখ্যানের বিকল্প সম্ভবনা। উপন্যাসের শৈলীচেতনা নিয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রথাগত কাহিনি খোঁজা অবান্তর। আখ্যান জুরে চরিত্র, ঘটনা, সময়, বাস্তব ও কল্পনার বিবরণী থাকে, তাতে গল্প, সময়, স্মৃতি, স্বপ্ন, সবকিছু মিলে এক রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করে চলে। তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন-

> "কাহিনি যখন কথক থেকে বিচ্যুত, যখন তার কোনও কিছু প্রমাণের দায় থাকে- কোনও মতাদর্শ, সমাজচেতনা যাই হোক না কেন- তখনই তা একটি মডেলে আটকে যায়।"[২]

আসলে লেখক প্রথাগত কাহিনিতে বিশ্বাস রাখেন নি। তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে বারবার সমাজ ও সভ্যতার গতি পথে এক ছকহীন জীবনবোধের কথা বলতে চেয়েছেন। এই 'ছকহীনতা মানে গল্পহীনতা' নয় একথা তাঁর গল্প-উপন্যাস পাঠে আমরা বরাবর লক্ষ করেছি।

রবিশংকর বল কাহিনিহীন কাহিনি রচনায় অগ্রসর হয়েছেন 'তিমিরের হার্লেম' (২০০১) উপন্যাসটিতে। তাই বলে গল্পত্বহীন হয়ে যায়নি। আখ্যানের বাচনে এক ভ্রাম্যমাণ সত্তার অবকাশে কাহিনি যেন এক অনিশ্চিত গ্রন্থনার প্রতিকল্প হিসেবে গড়ে তুলেছে। 'তিমিরের হার্লেম' উপন্যাসটি জর্জ পেরেকের 'Species of Spaces' গ্রন্থটির অনুকরণে লেখা হলেও আলাদা মাত্রা লাভ করেছে নানা শৈলীচেতনার প্রবাহে। কীভাবে একটি আখ্যান হয়ে উঠতে পারে, অবয়ব শূন্য থেকে এক 'আকার' দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখক শূন্যতা থেকে আকার এবং সেই আকার থেকে জন্ম নিতে পারে এক গল্পের। কাহিনি গ্রন্থনার এই চেষ্টা লক্ষ করা যায় আখ্যানের বলয়ে। লেখক নিজেই উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়েছেন-

> "এই উপন্যাসের পিছনে কিছু নেই, সামনে কিছু নেই। এই উপন্যাসের কোনো অন্দর নেই, বাহিরও নেই। একটি ঘাস থেকে অন্য ঘাস, তার থেকে আর এক ঘাস যেভাবে জন্মায়, এই উপন্যাসের জন্মও সেভাবেই।"[৩]

উপন্যাসটি জর্জ পেরেকের আদর্শে সাতটি পর্বে বিন্যস্ত- তিমিরের সাদাপাতা, বিছানা, শোওয়ার ঘর, ফ্লাট, বাড়ি, পাড়া ও শহর। পর্ব গুলিতে গল্পের অজস্র স্তর আছে, কিন্তু কোনো নিটোল গল্প নেই। সময় ও পরিসরে বিভিন্ন বাচনে জীবনবোধের অংশ ও ভগ্নাংশ গুলি উঠে আসে সহজে। 'তিমিরের সাদা পাতা' কবিতার আবেসে এগিয়ে যায় আখ্যানের গর্ভে। এখানে লেখক যেন লেখক নন, আখ্যান নিজেই নিজেকে লিখে চলেছে। এক শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা কিংবা পূর্ণতা থেকে শূন্যতার দিকে। তিমিরের সাদা পাতা থেকে রাস্তা, বাড়ি, সিঁড়ি, ঘর, টেবিল, ঢাকনা, খাঁচা, পাখির বাসা, ডিম, ডিমের ভিতর লুকিয়ে থাকা এক পাখি, প্রভৃতি মিলেমিশে রহস্যময় বোধে আখ্যানের অঙ্গ সৃষ্টি। আবার এই আখ্যানের আকল্প নামক খোলস থেকে পরস্পর সংযোগহীন হয়ে ফিরে যায় পূর্বের শূন্যতার অবস্থানে। এই যাওয়া-আসার মাঝে চেতনার নানা বিচিত্র গল্প ও গল্পহীন, বাস্তব ও পরাবাস্তব পর্যায়ে জন্মমৃত্যুর খেলা চলে।

'বিছানা' পর্বে আমরা দেখি তিমিরের নিজস্ব সাত বাই চার সিংগল বেড এর প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে তার নিজস্ব কোনো বিছানাই ছিল না। এই বিছানা, চাদর, সাদা রং-এর চাদর হয়ে উঠেছে স্ত্রী সুতপা ও তিমিরের জীবনবোধের গল্পহীন গল্প। আসলে উদ্বাস্তু জীবনের নানা বৈচিত্রময় স্মৃতি এখানে তিমিরকে আরও

রক্তাক্ত করে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে তিমিরের এই কল্পিত বিছানা হয়ে উঠেছে মানসভ্রমণের বাহন। এই বিছানা শুধু বিছানা নয়, যেন হয়ে ওঠে পিতৃপুরুষ ও নিজের যাযাবরবৃত্তির নানা অনুষঙ্গ।

'শোওয়ার ঘর' পর্বে লক্ষণীয় বিষয় যে, তিমিরের নিজস্ব বিছানা যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় একটি শোওয়ার ঘরের। জীবন-যাপনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও তিমিরের কাছে তা অপার্থিব থেকে যায়। ঘর, বাড়ি, ফ্লাট ও ভাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে স্বপ্নের প্রতীক স্বরূপ। নানা চরিত্রের রহস্যময় জীবনবোধে তিমির মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বপ্ন ও জাগরণে স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পৃক্ত হয়ে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

আবার তিমিরের নিজস্ব বিছানা ও শোওয়ার ঘর পেয়ে যাওয়ার গল্প থেকে ফ্ল্যাট পর্বের গল্পে আমরা প্রবেশ করি। আদিম মানুষ গুহা কেন্দ্রিক জীবন-যাপন করত। কিন্তু আজ আধুনিক সভ্যতার মানুষ ঘর নয়, বাড়ি নয়, তারা ফ্ল্যাটে বসবাস করতে ভালোবাসে। এই শহর কেন্দ্রিক জীবনবোধ হয়ে ওঠে ছিন্নমূলগ্রস্থ, তাদের না আছে অতীত, না থাকবে কোনো ভবিষ্যৎ। তবে আধুনিক আসবাব পত্রের সঙ্গে জরিয়ে থাকে নতুন যাযাবরবৃত্তির আততি।

'বাড়ি' পর্বে তিমির ভাড়াবাড়ি নেওয়ার জন্য এসে প্রবেশ করে আরেক রহস্যময় স্তরে। পুরনো বাড়ির সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ধাপে অসংখ্য গল্প যেমন ছিল, তেমনি সরোজিনী, তরুলতা, সমীর, রত্নাবৌদি, স্বরূপ প্রমুখ চরিত্রদের সংস্পর্শে চলে আসে নতুন গল্পাংশের আদল। সিঁড়িহীন যেমন ঘরে প্রবেশ অসম্ভব তেমনি এই চরিত্ররা না এলে গল্পের ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আধুনিকোত্তর সময়ে পুঁজিবাদের আগ্রাসনে বাড়িগুলিও হয়ে ওঠে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তাতে তিমিরের অপলক দৃষ্টিতে থাকে অবসাদের ছায়া।

'পাড়া' পর্বে আমরা দেখি, তিমিরের পুরনো পাড়ার সঙ্গে নতুন পাড়ার স্মৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ঘরবাড়ি, মানুষ, পশু, পাখি, রাস্তা, ঘাট, পুকুর, ঝিল, বাগান, গাছপালা প্রভৃতিতে নতুন ও পুরনো সময়ের মেশানো গল্পের মধ্যে তিমিরের গতায়ত দেখা যায়। তিমিরের মনে হয়-

> "মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে- সত্তর হয়নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে, কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকার মেসের বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, এখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনোদিনও ফুরোয় না যেন আর।"[৪]

সময়ের দাবানলে সাধ, আহ্লাদ, প্রেম, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সবকিছু পুরনো সময়ের মতো ফিকে হয়ে আসে। তাই তিমিরের মনে হয়, জীবনের আশ্চর্য সব গল্পগুলি যা একদিন সৃষ্টি হয়েছিল, তা জীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

'শহর' পর্বে লেখক আধুনিক কলকাতাকে ঘিরেই নানা গল্পের আমদানি করেছেন। এসপ্ল্যানেড, পার্কস্ট্রিট, ইস্টার্ন বাইপাস, সাদার্ন এভিনিউ, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ইলিয়ট রোড, দেশপ্রিয় পার্ক বিভিন্ন স্থানের বাস্তব ও কাল্পনিক জীবনবোধকে তিমির অনুভব করে। এই শহরেই তিমিরের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। স্মৃতি, স্বপ্ন ও নির্লিপ্ত জীবন কালো আত্মার কুহকে তিমিরকে ধরা দেয়। কিন্তু আধুনিক শহরের মাঝে নেই কোনো নৈতিক মূল্যবোধ, নিজগৃহে পরবাসী হয়ে কীটপতঙ্গের মতো জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে। যে শহরকে ঘিরে তিমিরের স্বপ্ন ছিল, তা আজ ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের শহরে পরিণত হয়েছে।

উপ্যনাসটিকে শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, উপন্যাসের সংকল্প ও গঠন পুরোপুরি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। উপন্যাসটির ফর্ম চেতনা লেখক যেভাবে নির্দেশ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল

উদাহরণ। লেখক বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন প্রকরণে। উপন্যাসের বয়ানে যে জীবনবোধ উদ্ভাসিত তা সামগ্রিকভাবে বহুস্বরিক ও ব্যঞ্জনাময়। জীবনবোধের এই বহুস্বরিকতা বুঝতে গেলে তত্ত্বচেতনার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। আর উপন্যাসে ভাষা ও সংলাপ হল জীবনকে উপলব্ধি করার প্রধান হতিয়ার। তাই পবিত্র সরকার যথার্থই বলেছেন- "শৈলীবিজ্ঞানের বড়ো অর্থই সাহিত্যভাষা ও সাহিত্যের নির্মাণকলার সঙ্গে যুক্ত।"[৫] ন্যারেটিভের ভিতর বহু ন্যারেটিভ নতুন বার্তা বহন করেছে লিখন শৈলীর মাধ্যমে। ফ্রিম্যান শৈলীর ত্রি-তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছেন বেশি 'আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', 'একই ধরণের বিন্যাসের পুনরাবৃতি' ও 'ব্যাকরণের সম্ভাবনার বিশেষ নিষ্কাশন'। আবার কেউ কেউ বিচ্যুতির গুণগত ও মাত্রাগত উপাদানের উপর বেশি জোর দিতে চাইছেন। মুকারভস্কি বিচ্যুতির রূপকে নর্ম-এর আদলে লক্ষ করেছেন এবং প্রমুখন এর ব্যাখ্যা করেছেন। তবে স্থান, কাল এবং সমাজের প্রেক্ষাপটে লেখকের নিজস্ব ছকের উপর জোর দিয়েছেন। ড. অভিজিৎ মজুমদার যথার্থই বলেছেন-

> "লেখক কোনো ভাষা-সংস্থানকে (system of language) প্রয়োগ করেন নিজের ইচ্ছে অনুসারে, যার ফলে ভাষাপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব এক শৈলী। শৈলীর এই নির্মাণে ভাষা উপাদানের নির্বাচন (choice) রচয়িতার স্বকীয়তা প্রকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে।"[৬]

আবার অনেকে ভাষার গঠন মূলক ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonological), বাক্যতত্ত্বিক (syntactic) ও শাব্দিক (lexical) প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব অনুসারে ভাষা ও সংলাপে বহুবিধ বৈশিষ্ট ধরা পরে, তা বলার অপেক্ষা থাকে না।

ভাষার ধ্বনিগত শ্রুতি মধুরতার জন্য ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার গতিশীল চিত্রকল্প ও বাক প্রতিমা সৃষ্টির (Phonaesthetic image) জন্য প্রধান ও অপ্রধান ধ্বনি প্রবাহ লেখক সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছেন। যেমন— কিচ কিচ, উচু উচু, হন হন, হো হো, ঝক ঝক, হা হা, হি হি, হিস হিস, ধূ ধূ, ছম ছম, ভন ভন, ফিস ফিস, বিড় বিড়, মুড় মুড়, পর পর, ছুঁই ছুঁই, টক টকে, জ্বল জ্বল, মিটি মিটি।

বাক্যে ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বৈচিত্র দেখিয়েছেন। তাতে শৈলীগত ভাবে বাক্য গঠনে ভাষার এক নিজস্বতা ফুটে উঠেছে। যেমন- ভাবতে ভাবতে, বুনে বুনে, কাঁদতে কাঁদতে, থাকতে থাকতে, চলতে চলতে, বলতে বলতে, উঠতে উঠতে, শুয়ে শুয়ে, বসে বসে, খুঁজে খুঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে, টলতে টলতে, হতে হতে। সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দকে ব্যবহার করেছেন মূলত বচনের দিকে লক্ষ রেখে। যেমন- নাড়িভুড়ি, ছেলেপুলে, সাজগোজ, ভাঙাচোরা, ভাবনা চিন্তা, হাটা চলা, মানুষ জন, গ্রাম-মফসসল, ছেঁড়া খোঁড়া, বাসনকোশন, কগজপত্র, পত্রপত্রিকা, জামাকাপর, ভাগবাঁটোয়ারা ইত্যাদি। এছাড়াও সর্বনাম ও বিশেষণ দ্বিত প্রয়োগ এবং বচনের (পথেদের, গাছেদের, কথাদের) ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহারে নতুন নতুন তাৎপর্যকে তুলেধরেছেন। লেখকের ভাষা ও সংলাপে ভাব, অনুভুতি ও রহস্য ধরা পড়েছে সম্মিলিত রচনারীতির মাধ্যমে। তিনি শব্দ ব্যবহার, শব্দ গঠন, বাকবিন্যাস, যতিচিহ্ন, অলংকার, প্রতীক ও গঠন মূলক উপাদান গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। এই ভাষা নির্মাণ কৌশলে শুধুমাত্র শৈলীগত বৈচিত্র ধরা পড়েছে তা কিন্তু নয়, গল্পের পাঁজরে জন্ম নিতে থাকে আরেক গল্পের আরম্ভ বিন্দু। এবং তা হয়ে ওঠে শৈলীবিজ্ঞানের শৃঙ্খলবদ্ধ উপাদান।

রবিশংকর তাঁর উপন্যাসে আটপৌর শব্দের পাশাপাশি তৎসম, তদ্ভব, দেশি বিদেশি, আরবি, ফারসি, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন যত্ন সহকারে। আজ-কাল দৈনন্দিন কথা বলার ভাষায় কিংবা বলা যেতে পারে আমাদের চিন্তার ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেখানে গল্প-উপন্যাসেও লেখকরা

ইংরেজি শব্দ সচেতন ভাবেই ব্যাবহার করছেন। ইংরেজি শব্দ ও বাক্য এবং ইংরেজি বাংলা মেশানো বাক্য ব্যবহার করেছেন বক্তব্য ও ইমেজ সৃষ্টিতে। যেমন—

> "শুনুন মি, বিল অ্যান্ড অল দ্য গাইস্ আমরা আপনাদের বার্বি পুতুল নিয়েছি. আমাদের আশ্চর্য মাটির পুতুলগুলি হারিয়ে গেছে।"[৭]

ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা বিভক্তি যুক্ত করেও বাক্য গঠন করেছেন। ছোটো ছোটো ইংরেজি বাক্য এবং 'ঘর-কাম-ব্যালকনি' শব্দের মতো অজস্র শব্দ, বাংলা ভাষায় আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাঁর আখ্যানের কুশী-লবরা রক্ত-মাংসের নয়; তবুও তাঁর লেখায় অসংখ্য ইংরেজি শব্দ, ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে শব্দ ব্যবহার করেছেন মূলত চরিত্রের ভাব, বক্তব্য, অনুভুতি, আচরণ, শিক্ষা ও সামাজিক পরিসরে। যেমন- বার্বিপুতুল, প্রিন্স কুমার, জ্যামজট, ফ্ল্যাট বাড়ি, রাস্তার ট্রফিক, নতুন মডেলের গাড়ি প্রভৃতি।

রবিশংকর বলের নির্মিত গদ্য ভাষায় কাব্যিক রসের আস্বাদন ঘটে খুবই সহজেই। তাঁর কাব্যময়তা যেন গদ্যের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু প্রথাগত অন্বয় থেকে বিচ্যুতি হলেই যে কাব্যিক হবে, আর বিচ্যুতি না ঘটলে কাব্যিক হবে না এরকম পূর্বশর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এখানে আদর্শ গদ্যভাষা থেকে কাব্যভাষার আন্বয়িক বিচ্যুতি- ব্যাকরণগত, মাত্রাগত ও শব্দগত বিচ্যুতি বহুবার আমরা লক্ষ করি। যেমন-

> "তোমার পেটের ভিতর নক্ষত্রমণ্ডলী- ঘন দুধের মতো আকাশ- তোমার পেটের ভিতরে একটা ডানাওলা বিছানা উড়ে যাচ্ছে-।"[৮]

এখানে শব্দের মাত্রাগত বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় চরিত্রের চিন্তা-ভাবনায়, কাজকর্ম ও অবস্থানগত পরিস্থিতিতে। আবার কোথাও কোথাও ব্যাকরণগত বিচ্যুতি আমরা লক্ষ করি যে, বাক্যগঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থানে বিচ্যুতি ঘটিয়ে বাক্যের অর্থের উপরে জোর দিয়েছেন। বাক্যান্বয়ে বিভিন্ন ভাবে বিচ্যুতি ঘটিয়ে লেখক তাঁর গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন। যেমন- "সে কী রাস্তা, যার মাথা উপরে শুধু আকাশ, আকাশের ওপারে আকাশ।"[৯]

আখ্যানে সরল ও যৌগিক বাক্য নির্মাণে বিচিত্র রূপ আমরা দেখি। ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহারে বাক্যের নর্ম মেনে হয় নি। বাক্য গঠনে শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্যের পুনরুক্তি ব্যবহারে সামন্তরালতার (Parallelism) ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের জীবনবোধের যে জটিলতা ও অনিশ্চয়তাকে গুরুত্ব দিতে লেখক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই তিমিরের বয়ানে পাই-

> "তার কণ্ঠনালিতে একটা ইঁদুর ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, আর সেই ইঁদুরটা মাঝে মাঝেই কিচ কিচ করে কী যে বলে উঠতে চায়, তিমির আজও সেই কথা বুঝে উঠতে পারেনি।"[১০]

আবার বাড়ি পর্বেও তিমিরের সেই অনিশ্চিত ও জটিল রহস্যময় আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই-

> "আমি তাই কণ্ঠনালির ইঁদুরটাকে এত যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি, কিচ কিচ করে, ও কী বলতে চায়, আমি বুঝতে পারিনা; ওইটুকুই আমার কাছে বেঁচে থাকার রহস্য।"[১১]

মোটামুটি শব্দ বা বাক্যাংশ ঠিক রেখে প্রায় সেই একই কথার পুনরুক্তি ঘটে চলে। পাড়া পর্বেও তিমিরের আর্তনাদ শুনতে পাই যে-

> "আমার কণ্ঠনালিতে একটা ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়। কিচকিচ করে সে যে কত কথা বলে, আমি বুঝতেও পারি না।"[১২]

এবং শেষপর্ব শহরেও আমারা দেখতে পাই তিমিরের কুহক আত্মার প্রশ্ন ও উত্তর- "এই শহরে জন্মে আমি কী পেয়েছি জানো? কণ্ঠনালিতে একটি ইঁদুর।"[১৩]

ঔপন্যাসিক অলংকার ও চিত্রকল্প ব্যবহারে প্রচলিত ধারণা থেকে আলাদা মাত্রায় গ্রহণ করেছেন। চিত্রকল্প হল 'শব্দদ্বারা নির্মিত ছবি', এই চিত্রকল্পের বিন্যাসে ইন্দ্রিয়ানুভুতি স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। বাক্-নির্মিত শিল্প-কৌশলে প্রকৃতি, স্মৃতি, অনুভুতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিষয়কে লেখক তুলে ধরেছেন। স্থান-কাল, শব্দ, গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়কে উপলব্ধি করানোর জন্য রঙ, ফুল, মানবেতর প্রাণীদের আগমন ঘটান চিত্রকল্পে। প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে লেখকের অলংকার সৃষ্টিতে। যেমন— "সে ঘর যেন পুরনো পৃথিবীর গুহার মতো।"[১৪] বিভিন্ন রঙের ব্যবহারেও লেখক নানা রকম তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন। সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির বক্তব্য, অনুভব, ভাব, স্বপ্ন, স্মৃতি প্রভৃতিতে বা একই বস্তুর অনেক তাৎপর্য বোঝাতে রঙের নানা অর্থবহ বেশ লক্ষণীয়। যেমন— সাদা, সবুজ, লাল, হলুদ, নীল, কালো, সোনালী, রুপালী, বাদামি, ফিরোজা রং, দবদবে সাদা রং। আবার বিভিন্ন ফুলের ব্যবহার লক্ষণীয় যেমন—মে-ফ্লাওয়ার, রাধাচূড়া, জুই, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, রজনিগন্ধা প্রভৃতি নানা তাৎপর্য ও চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিভিন্ন মানবেতর প্রাণীর প্রসঙ্গ ব্যবহার হয়েছিল প্রতীক রুপে। রবিশংকর বলের উপন্যাসে এই যে প্রতীকের ভির ও মনুষ্যেতর জগতে ভ্রমণ, তা মানুষের অনুষঙ্গেই প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রতীক বস্তুর ভাবমূর্তি এবং ভাবের তাৎপর্য বোঝাতে বিভিন্ন প্রাণীর প্রসঙ্গ আলাদা আলাদা মাত্রায় তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। যেমন- কুকুর, বেড়াল, পাখি, পেঁচা, বক, কাক, চড়ুই, কোকিল, মাছ, ঘোড়া, চামচিকে, শালিক, গরু, মোষ, আরশোলা, মাকড়সা, পিঁপড়ে, জোনাকি, গাধা, টিয়া, রামছাগল, হাঁস, ইদুর, পোকা, মাছি, সিন্ধুসারস, ময়না, অক্টোপাস, সিংহ, সাপ, কাকাতুয়া ইত্যাদি। মানবজীবনের নানা মাত্রাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এই মানবেতর প্রাণীর মাধ্যমে, তা শৈলীগত স্বাতন্ত্র্য বটে।

উপন্যাসে বিছানা, নিজস্ব বিছানা, মৃতের বিছানা, খাট, মরার খাট, তিমিরের স্বপ্নের খাটের মাপ সাত বাই চার, স্বপ্ন, শোওয়ার ঘর, ফ্লাট, শহর, স্টেশন, সিঁড়ি প্রভৃতি শব্দবন্ধ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কালো আত্মার উপলব্ধিতে বারবার ভুত, আত্মা, দৈত্য (ডাইনি, শাঁখচুন্নি, ধুমসোভূত) প্রভৃতির প্রসঙ্গ এসে আখ্যানে এক কুহক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি এবং এই আত্মার উপলব্ধিতে বহু চরিত্রের আগমন ঘটিয়েছেন। আখ্যানের পরিধি ও গঠন বিন্যাসে কবিতা, উপন্যাস ও গানের ব্যবহারে এক শৈলীগত মাত্রা লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে জীবনানন্দ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, হেনরি মিলার, পল এলুয়ার, জর্জ পেরেক, প্রমুখ কবি-লেখকদের বিভিন্ন আখ্যান কেন্দ্রিক সংলাপ ও চরিত্রের উপস্থিতিতে এবং তাদের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তিমির। জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' উপন্যাসের সংলাপ ব্যবহার ও মাল্যবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিমিরের মনোজগতকে উদ্ঘাটন করেছেন। দাদু-দিদিমার প্রেম কাহিনি উপস্থাপনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস থেকে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া আখ্যানের কুশি-লবদের আত্মার মধ্যে মাইকেল (মাতাল), জনি (উন্মাদ), রোশেনার (উন্মাদ), মেরিলন (বেশ্যা) ও সাইমন প্রত্যেকের আত্মার সঙ্গে তিমিরের একাকার হয়ে যাওয়া কলকাতা শহরের স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে কুহকী পরিসর।

লেখকের ব্যক্তিক রুচি হল অনপেক্ষ। রবিশংকর শব্দ, ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগে আত্ম ব্যক্তিত্বের চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন। তিমিরের চিন্তা-ভাবনা, স্মৃতি, কল্পনা ও বাস্তব উপলব্ধিতে লেখক জটিল ও অনিশ্চয়তার ভিন্ন এক 'মন্তাজ' গড়ে তুলেছেন। যা গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ বা মিলান কুন্দেরার উপন্যাসের মতো বাস্তব, স্বপ্ন ও কল্পনার বহুবিধ মিশেল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আধুনিকোত্তর আখ্যানে লক্ষ করা যায় বিষয়-বিষয়ী, চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িত, ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যেন শূন্য থেকে সূচনার উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> "লেখক এখন যুগপৎ জীববিশ্বের প্রস্তাবক ও ভাষ্যকার; তাঁর লিখন শৈলী কোনো পূর্বনির্ধারিত অভিজ্ঞানের পক্ষপাতী নয় আর। কোথাও যেন ক্রমবিকাশ ও পরিণতির প্রাসঙ্গিকতা নেই; কি অন্তর্বস্তুতে কি আকরণে কি ভাষায় কি শৈলীতে শুধু নতুন-নতুন সূচনা বিন্দু। বিশেষ ধরণের স্বতোলিখন পদ্ধতি যেন আখ্যানকারদের পথ থেকে পথান্তরে সঞ্চালিত করছে কেবলই।"[১৫]

এই আধুনিকোত্তর আখ্যান- বিশ্বে নেই কোনো আরম্ভ, নেই কোনো সমাপ্তি। আছে শুধু লিখন-শৈলীর দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার অন্বিষ্ট; আর নতুন নতুন চিহ্নের আদলে বিকল্প বাস্তবের বিকল্প গ্রন্থনার ক্রমবিকাশ। তাই পাঠক আজ যে কোনো পৃষ্ঠা থেকে পাঠ আরম্ভ করতে পারে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকেরও কাছে পাঠ্য পড়ার শৈলী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সহজে।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ১৫।

২) বল, রবিশংকর। 'প্লট ভাঙো, গল্প লেখো', গদ্যসংগ্রহ-১। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৯৯।

৩) বল, রবিশংকর। তিমিরের হার্লেম। দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৩।

৪) তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭।

৫) সরকার, পবিত্র। শৈলীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা; গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ৩০।

৬) মজুমদার, অভিজিৎ। শৈলীবিজ্ঞানঃ তত্ত্ব ও স্বরূপ। শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২।

৭) বল, রবিশংকর। তিমিরের হার্লেম। দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৪৪।

৮) তদেব, পৃ. ১৭।

৯) তদেব, পৃ. ৪৯।

১০) তদেব, পৃ. ২।

১১) তদেব, পৃ. ২৩।

১২) তদেব, পৃ. ৪৪।

১৩) তদেব, পৃ. ৪৬।

১৪) তদেব, পৃ. ১৫।

১৫) ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের স্বরান্তরঃ শৈলীর অভিঘাত। শৈলী চিন্তাচর্চা, সম্পাদনা- বিপ্লব চক্রবর্তী, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩, পৃ. ৭২।